ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সমালোচনাকে ইতিহাসবিদরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও প্রভাব বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অঙ্গনে টেনে নিয়ে গেছেন। ফলে এই প্রথম বিজ্ঞানের ইতিহাস, আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের মূলস্রোতের আখ্যানের এক অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আগেকার বিবরণগুলোতে দেখানো হত যে প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান আস্তে আস্তে নির্বিরোধে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন তার জায়গায় এমন এক বিজ্ঞানের ভাবচিত্র তুলে ধরা হয় যা 'ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে হাঁসফাঁস করে মরছে,' যার পাল্লা এবং যার ক্রিয়াকর্ম ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব রক্ষার প্রয়োজনের দ্বারা নির্ধারিত ও ব্যাহত হয়, যার সর্বাঙ্গে জাতিবৈষম্যর ছাপ। যেমন ডেভিড আর্নল্ড তো জোর দিয়ে বলেছেন যে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান রূপ ধারণ করার পথে জ্ঞানের 'বিস্তারটা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, জ্ঞানকে অস্বীকার করাটাও ততখানি গুরুত্বপূর্ণ।[৬৮]

সীমিত মাত্রায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তার হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার গতি গুরুতরভাবে শ্লথ হয়ে পড়েছিল।[৬৯] বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের কথা যদি তোলা যায়, তাহলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকাকে 'হালকা প্রণয়রঙ্গের অস্থির লীলাখেলা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৭০] প্রথম দিকে যা কিছু সাফল্য এসেছিল, সেসবই এসেছিল ব্যক্তিগত বা স্বশাসিত উদ্যোগ মারফত। যেমন ধরা যাক জেমস প্রিন্সেপ-এর কথা। সরকারিভাবে তিনি ছিলেন কলকাতা টাঁকশালের পরিচালক। কিন্তু তিনিই প্রাচীন ভারতচর্চার পদ্ধতি বদলে দেন। গোড়ার দিকে ভারতচর্চায় জোর পড়ত কেবল সাহিত্যিক উৎসগুলির ওপর। তিনি সেখান থেকে সরে এসে পুরাতত্ত্ব, শিলালিপি আর মুদ্রাবিজ্ঞানের চর্চার ওপর জোর দিলেন। শিবালিক অঞ্চলের সমৃদ্ধ জীবাশ্ম-ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার

---

[৬৭] বিশ্বনাথন ১৯৯৮: ১২৬; এছাড়া দ্রষ্টব্য চক্রবর্তী ১৯৯৮: অধ্যায় ৬; কোসম্বি ২০০০: ভূমিকা; কোসম্বি ২০০৭: ভূমিকা।

[৬৮] আর্নল্ড ২০০০: ৯২; এছাড়া দ্রষ্টব্য কুমার ১৯৮২: ৬৩-৮২।

[৬৯] পরে পরিবেশ আর বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনার অধ্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[৭০] আর্নল্ড ২০০০: ২৫।

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography